গীতা-প্রবাহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ সহায়িকা

মূল উৎস → *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ – শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

সহায়ক উৎস → *সুবোধিনী – শ্রীল শ্রীধর স্বামীপাদের ভগবদ্গীতা টীকা।

*সারার্থ বর্ষিণী – শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভগবদ্গীতা টীকা।

*গীতা ভূষণ – শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের গীতা ভাষ্য।

*বিদ্বৎ রঞ্জন ও *রসিক রঞ্জন – শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতা ভাষ্যদ্বয়।

*আমার শরণাগত হও – শ্রীপাদ ভূরিজন দাস।

সংকলন - পদ্মমুখ নিমাই দাস

গোবিন্দ চরণ হৈতে, সুরধনী গঙ্গা যৈছে,
ধরণীতে প্রবাহিত হয়।
সে গোবিন্দের মুখ হৈতে, গীতার প্রবাহ তৈছে,
সাধু-সন্ত সভায় সদা বয়॥
সে প্রবাহের এক কণ, ডুবায় যে সর্বজন,
কেন ভাই ভাবিছ অন্যথা।
সে প্রবাহের এক বিন্দু, শুষ্ক করে ভব সিন্ধু,
অলৌকিক এ অদ্ভুত কথা॥
তাহে নিত্য স্নান করি, ওহে ভাই ভজ হরি,
শিরে ধরি তোমার চরণ।
জ্ঞাতি-গোষ্ঠী-বন্ধু লইয়া, সে প্রবাহে ডুব যাইয়া,
পদ্মমুখ করে নিবেদন॥

PADMAMUKHA NIMAI DAS

গীতা-প্রবাহ

চতুর্থ অধ্যায় – জ্ঞান-যোগ

অধ্যায় কথাসার

অপ্রাকৃত পারমার্থিক জ্ঞানের স্বরূপ উদ্ঘাটন
এই অধ্যায়ে শ্রীভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাবের রহস্য, লীলার নিত্যত্ব এবং কর্ম ও জ্ঞানযোগের মূল উদ্দেশ্য বর্ণীত হয়েছে। আত্মার চিন্ময় তত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব এবং ভগবান ও আত্মার সম্পর্ক-এই সব অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান বিশুদ্ধ ও মুক্তিপ্রদায়ী। এই প্রকার জ্ঞান হচ্ছে নিঃস্বার্থ ভক্তিমূলক কর্মের (কর্মযোগ) ফলস্বরূপ। পরমেশ্বর ভগবান গীতার সুদীর্ঘ ইতিহাস, জড় জগতে যুগে যুগে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং আত্মজ্ঞানলব্ধ গুরুর সান্নিধ্য লাভের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করেছেন।

এই অধ্যায়ের মূল-শিক্ষা

- ভগবানের অবির্ভাব, তিরোভাব, ও তাঁর যাবতীয় লীলা ভগবানের ইচ্ছায় প্রকাশিত হন, তা সকলই অতিমর্ত্য।
- তাঁর দেহদেহীতে ভেদ নাই, তা পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বস্তু।
- অবতারবাদ স্বীকারের দ্বারাই মঙ্গল লাভ হয়।
- জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই তার বদ্ধদশার কারণ।
- সমস্ত জ্ঞানের উদ্দেশ্যই সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ।
- প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা তত্ত্বদর্শিগণের নিকট জ্ঞান লাভ হয়।
- শ্রদ্ধাবানই জ্ঞান লাভ করতে পারেন।
- সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়।

এই অধ্যায় সম্পর্কে পূর্বাচার্য গীতা-ভাষ্যকারগণের সিদ্ধান্ত

*** শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর →

তুর্য্যে স্বাবির্ভাবহেতোর্নিত্যত্বং জন্মকর্মণোঃ।
স্বস্যোক্তং ব্রহ্মযজ্ঞাদিজ্ঞানোৎকর্ষপ্রপঞ্চনম্॥
চতুর্থ অধ্যায়ে স্বীয় আবির্ভাবহেতু নিজজন্মকর্মের নিত্যত্বকথিত ও ব্রহ্মযজ্ঞাদিজ্ঞানের উৎকর্ষ বিবৃত হয়েছে।

*** শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ →

তুর্য্যে স্বাভিব্যক্তিহেতুং স্বলীলানিত্যত্বং সৎকর্মসু জ্ঞানযোগম্।
জ্ঞানস্যাপি প্রাগ্ যন্মাহাত্ম্যমুচ্চৈঃ প্রাখ্যদ্দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ॥
চতুর্থ অধ্যায়ে এই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভিব্যক্তি অর্থাৎ আর্বিভাবের কারণ, স্বীয়লীলার নিত্যত্ব, সর্ববিধ সৎকর্মের মধ্যে জ্ঞানযোগ এবং জ্ঞানেরও পূর্বে যে মাহাত্ম্য সেটাই উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছেন।

অধ্যায় সঙ্গতি

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে কামকে জয় করার উপায় হিসেবে শ্রীভগবান চিৎ-শক্তি[1] বা জ্ঞানের কথা বলেছিলেন। এখন এই অধ্যায়ে সেই জ্ঞানযোগের কথা বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে।

1 সৎ – নিত্য; চিৎ – জ্ঞান; আনন্দ – আনন্দ

অধ্যায় রূপরেখা

শ্লোক ১-১০ – শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক দিব্যজ্ঞান
শ্লোক ১১-১৫ – দিব্যজ্ঞানের প্রয়োগ
শ্লোক ১৬-২৪ – জ্ঞানযোগের ভিত্তিতে কর্ম
শ্লোক ২৫-৩৩ – যজ্ঞ থেকে দিব্যজ্ঞানে
শ্লোক ৩৪-৪২ – উপসংহার

শ্লোক ১-১০ – শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক দিব্যজ্ঞান

📖 শ্লোক ১-৩ — (সঙ্গতি) পূর্বের দুটি অধ্যায়ের দ্বারা জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ এই উভয়যোগের ফল একরকম বলে এই অধ্যায়ে তা একত্র করেই তাঁর বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে প্রশংসা করে তিনটি শ্লোকে বলছেন –

গীতার পরম্পরা – পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন – আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেছিলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। এভাবেই পরম্পরা মাধ্যমে প্রাপ্ত এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং তাই সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে। সেই সনাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং তাই তুমি এই বিজ্ঞানের অতি গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

📖 শ্লোক ৪ — (সঙ্গতি) শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সূর্যদেবের প্রতি যোগ-উপদেশ প্রদান করা অসম্ভব মনে করে অর্জুন বললেন –

অর্জুনের সংশয় – সূর্যদেব বিবস্বানের জন্ম হয়েছিল তোমার অনেক পূর্বে। তুমি যে পুরাকালে তাঁকে এই জ্ঞান উপদেশ করেছিলে, তা আমি কেমন করে বুঝব?

📖 শ্লোক ৫ — (সঙ্গতি) এরূপ অর্জুনের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রীভগবান বললেন –

ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ ও পার্থক্য[2] – পরমেশ্বর ভগবান বললেন – হে পরন্তপ অর্জুন! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু তুমি পার না।

📖 শ্লোক ৬ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "তুমি ত অনাদি, তোমার আবার জন্ম কি? আর তুমি অবিনাশী, অতএব তোমার পুনঃ পুনঃ জন্মের কথা যে 'বহূনি মে ব্যতীতানি' ইত্যাদি বাক্যে বললে, তা-ই বা কিরূপ? এই কারণে পাপপুণ্যবিহীন যে ঈশ্বর তুমি, তোমার জীবের ন্যায় জন্মই বা কি করে হয়?"
অর্জুনের কাছ থেকে এরকম প্রশ্ন আশঙ্কা করে শ্রীভগবান বলছেন —

ভগবানের আবির্ভাব রহস্য – যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয় এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

📖 শ্লোক ৭ — (সঙ্গতি) কখন আবির্ভূত হন? —

হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অর্ধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।

📖 শ্লোক ৮ — (সঙ্গতি) কেন আবির্ভূত হন? —

সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

2 সম্বন্ধ – উভয়েই নিত্য; পার্থক্য – ঈশ্বর সর্বজ্ঞ কিন্তু জীব অজ্ঞ।

📖 শ্লোক ৯ — (সঙ্গতি) এবম্বিধ ভগবানের জন্ম ও কর্ম জানলে কি ফল তা বলছেন —

হে অর্জুন! যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।

📖 শ্লোক ১০ — (সঙ্গতি) ভগবানের জন্ম-কর্ম জানলে কিরূপে ভগবানকে লাভ করা যায়, তা-ই বলছেন —

এই পন্থা পূর্বপ্রমাণিত – আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন হয়ে, একান্তভাবে আমার আশ্রিত হয়ে, পূর্বে বহু বহু ব্যক্তি আমার জ্ঞান লাভ করে পবিত্র হয়েছে – এবং এভাবেই সকলেই আমার অপ্রাকৃত প্রীতি লাভ করেছে।

শ্লোক ১১-১৫ – দিব্যজ্ঞানের প্রয়োগ

📖 শ্লোক ১১ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "তাহলে তোমারও কি বৈষম্য দৃষ্টি আছে? যেহেতু এরূপে তুমি তোমার শরণাগতকে আত্মজ্ঞান দিয়ে থাক, অন্য সকাম ব্যক্তিগণকে দাও না?" এই আশঙ্কা করে শ্রীভগবান বলছেন —

ভগবানের নিরপেক্ষতা – যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, আমি তাদেরকে সেভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ! সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করে।

📖 শ্লোক ১২ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "তাহলে মুক্তি লাভের জন্য সকলেই কেন তোমাকে ভজনা করে না?" এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন —

দেবোপাসকরা সকাম – এই জগতে মানুষেরা সকাম কর্মের সিদ্ধি কামনা করে এবং তাই তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে। সকাম কর্মের ফল অবশ্যই অতি শীঘ্রই লাভ হয়।

📖 শ্লোক ১৩ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "কেউ সকাম ভাবে, কেউ বা নিষ্কামভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হয়—এতে কর্মের বিচিত্রতা ঘটে থাকে; এই বৈচিত্র্যের কারক যে তুমি সেই তোমাতে বৈষম্য নেই — এটি কেমন করে বলব? এই আশঙ্কায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন —

বর্ণাশ্রমের ভিত্তি – প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজে চারটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে।

📖 শ্লোক ১৪ — (সঙ্গতি) সেই অকর্তৃত্বকেই স্পষ্ট করে বুঝাচ্ছেন —

ভগবানের সাথে কর্মের সম্বন্ধ – কোন কর্মই আমাকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং আমিও কোন কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনিও কখনও সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

📖 শ্লোক ১৫ — (সঙ্গতি) ৪টি শ্লোকদ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টি-বৈষম্যের সম্ভাবনা পরিহার করে এখন বিস্তারিত ভাবে পূর্বোক্ত কর্মযোগের কথা বলার জন্য প্রাচীন প্রথা স্মরণ করাচ্ছেন —

মহাজনদের পদাঙ্ক – প্রাচীনকালে সমস্ত মুক্ত পুরুষেরা আমার অপ্রাকৃত তত্ত্ব অবগত হয়ে কর্ম করেছেন। অতএব তুমিও সেই প্রাচীন মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তোমার কর্তব্য সম্পাদন কর।

শ্লোক ১৬-২৪ – জ্ঞানযোগের ভিত্তিতে কর্ম

📖 শ্লোক ১৬ — (সঙ্গতি) সেই কর্মানুষ্ঠানও তত্ত্বজ্ঞানীদের সাথে বিচার করে করা কর্তব্য, কেবল লোক পরম্পরাগত বলে করা উচিত নয়, তা-ই বলছেন —

কর্ম-অকর্ম স্থির করা দুষ্কর – কাকে কর্ম ও কাকে অকর্ম বলে, তা স্থির করতে বিবেকী ব্যক্তিরাও মোহিত হন। আমি সেই কর্ম বিষয়ে তোমাকে উপদেশ করব। তুমি তা অবগত হয়ে সমস্ত অশুভ অবস্থা থেকে মুক্ত হবে।

📖 শ্লোক ১৭ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "এটি তো লোকপ্রসিদ্ধই যে দেহব্যাপার—স্বরূপই কর্ম, আর দেহ ব্যাপার শূন্যতাই অকর্ম, তবে কেন বলছ যে 'জ্ঞানীরাও ঐ বিষয়ে বিমোহিত?" এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন –

কর্মতত্ত্ব নিগূঢ় – কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। তাই কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা কর্তব্য।

📖 শ্লোক ১৮ — (সঙ্গতি) সেই কর্মসকলের তত্ত্ব যে দুর্বিজ্ঞেয় তা বুঝিয়া বলছেন —

কর্মের ধাঁধা – যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান। সব রকম কর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত।

📖 শ্লোক ১৯-২৩ — (সঙ্গতি) পূর্ববর্তী শ্লোকের, শ্রুতির অর্থ ও অর্থাপত্তিদ্বারা যে অর্থদ্বয় ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা-ই পাঁচটি শ্লোকে স্পষ্ট বলছেন —

যিনি যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই যথার্থ কর্মী –

শ্লোক ১৯ — যাঁর সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা কাম ও সংকল্প রহিত, তিনি পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত। জ্ঞানীগণ বলেন যে, তাঁর সমস্ত কর্মের প্রতিক্রিয়া পরিশুদ্ধ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে।

শ্লোক ২০ — যিনি কর্মফলের আসক্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সর্বদা তৃপ্ত এবং কোন রকম আশ্রয়ের অপেক্ষা করেন না, তিনি সব রকম কর্মে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও কর্মফলের আশায় কোন কিছুই করেন না।

শ্লোক ২১ — এই প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর মন ও বুদ্ধিকে সর্বতোভাবে সংযত করে কার্য করেন। তিনি প্রভুত্ব করার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে কেবল জীবন ধারণের জন্য কর্ম করেন। এভাবেই কর্ম করার ফলে কোন রকম পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

শ্লোক ২২ — যিনি অনায়াসে যা লাভ করেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ আদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না এবং মাৎসর্য্যশূন্য, যিনি কার্যের সাফল্য ও অসাফল্যে অবিচলিত থাকেন, তিনি কর্ম সম্পাদন করলেও কর্মফলের দ্বারা কখনও আবদ্ধ হন না।

শ্লোক ২৩ — জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, চিন্ময় জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম সম্পাদন করেন, সেই সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয়।

📖 শ্লোক ২৪ — (সঙ্গতি) সেরূপ পরমেশ্বরের আরাধনারূপ যে কর্ম তা জ্ঞানের হেতু বলে তাতে বন্ধন হয় না, অবএব তা অকর্ম হল। জ্ঞানারূঢ় অবস্থায় আত্মার কর্তৃত্ব নেই—এই বোধে কর্তৃত্বাভিমান বাধিত হওয়ায় তাঁর নিত্য দেহ রক্ষার্থ কর্ম সকলও অকর্ম হয়, এটিই "কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্লোকে (শ্লোক ১৮) বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখন আরূঢ় অবস্থায় কর্মে ও তাঁর অঙ্গে ব্রহ্মই সতত অনুপ্রবিষ্ট রয়েছেন, এটি দেখতে পেয়ে তাঁর সকল প্রকার কর্মই বিলীন হয়ে যায়, তা-ই জ্ঞাপন করছেন —

ভক্তের সবকিছুই চিন্ময় – যিনি কৃষ্ণভাবনায় সম্পূর্ণ মগ্ন তিনি অবশ্যই চিৎ-জগতে উন্নীত হবেন, কারণ তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ চিন্ময়। তাঁর কর্মের উদ্দেশ্য চিন্ময় এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি যা নিবেদন করেন, তাও চিন্ময়।

শ্লোক ২৫-৩৩ – যজ্ঞ থেকে দিব্যজ্ঞানে

📖 শ্লোক ২৫ — (সঙ্গতি) এই প্রকার যজ্ঞরূপে সম্পাদিত সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ জ্ঞান, সকল প্রকার যজ্ঞাদি উপায়েই লভ্য, সেহেতু সকল যজ্ঞ হতে ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, এটিই বিশেষভাবে জ্ঞাপন করার জন্য অধিকারিভেদে জ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপ বহু যজ্ঞের কথা ৮টি শ্লোকে বলছেন (২৫-৩২) —

শ্লোক ২৫-২৯

১) দৈবযজ্ঞ (কর্মযোগিরা) – কোনও কোনও যোগী দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার মাধ্যমে তাঁদের উপাসনা করেন।

২) ব্রহ্মযজ্ঞ (জ্ঞানযোগিরা) – অন্য অনেকে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সব কিছু নিবেদন করার মাধ্যমে যজ্ঞ করেন।

৩) সংযমযজ্ঞ (ব্রহ্মচারিরা) – কেউ কেউ (শুদ্ধ ব্রহ্মচারীর) মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি দেন।

৪) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ যজ্ঞ – অন্য অনেকে (নিয়মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা) শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। (ইন্দ্রিয় → অগ্নি; ইন্দ্রিয়ের বিষয় → ঘি)।

৫) আত্মসংযমরূপ যজ্ঞ (ধ্যাননিষ্ঠরা) – মন ও ইন্দ্রিয়-সংযমের মাধ্যমে যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী, তাঁরা তাঁদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ ও প্রাণবায়ু জ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।

৬) দ্রব্যযজ্ঞ – কঠোর ব্রত গ্রহণ করে কেউ দ্রব্য দানরূপ যজ্ঞ করেন।

৭) তপোযজ্ঞ – কেউ কেউ তপস্যারূপ যজ্ঞ করেন।

৮) যোগযজ্ঞ – কেউ কেউ অষ্টাঙ্গ-যোগরূপ যজ্ঞ করেন।

৯) স্বাধ্যায়যজ্ঞ – বেদ পাঠরূপ যজ্ঞ।

১০) জ্ঞানযজ্ঞ – বেদ অধ্যয়নরূপ যজ্ঞ করেন।[3]

১১) প্রাণায়াম যজ্ঞ – যাঁরা প্রাণায়াম চর্চায় আগ্রহী, তাঁরা অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে এবং প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে আহুতি দিয়ে অবশেষে প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রোধ করে সমাধিস্থ হন।

১২) নিয়তাহার যজ্ঞ – কেউ আহার সংযম করে প্রাণবায়ুকে প্রাণবায়ুতেই আহুতি দেন।

📖 শ্লোক ৩০ — (সঙ্গতি) এখন এই দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞকারীদের ফল বলছেন –

এঁরা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববিৎ এবং যজ্ঞের প্রভাবে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত আস্বাদন করেন, এবং তার পর সনাতন প্রকৃতিতে ফিরে যান।

📖 শ্লোক ৩১ — (সঙ্গতি) যজ্ঞ না করলে কি দোষ হয়, তা-ই বলছেন –

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করে কেউই এই জগতে সুখে থাকতে পারে না, তা হলে পরলোকে সুখপ্রাপ্তি কি করে সম্ভব?

3 শ্রীল শ্রীধর স্বামী, তাঁর টীকায় "স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ" এই শব্দকে স্বাধ্যায়যজ্ঞ বা বেদ পাঠ এবং জ্ঞানযজ্ঞ বা বেদ অধ্যয়ন (সেই বেদের গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গমের প্রচেষ্টা), এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

📖 শ্লোক ৪.৩২ — (সঙ্গতি) জ্ঞানের প্রশংসার জন্য যে যজ্ঞ সকলের কথা বলা হয়েছে, তার উপসংহার করছেন –

এই সমস্ত যজ্ঞই বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে এবং এই সমস্ত যজ্ঞ বিভিন্ন প্রকার কর্মজাত। সেগুলিকে যথাযথভাবে জানার মাধ্যমে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে।

📖 শ্লোক ৩৩ — (সঙ্গতি) কর্মযজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ যে শ্রেষ্ঠ তা-ই বলছেন –

হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেয়। হে পার্থ! সমস্ত কর্মই পূর্ণরূপে চিন্ময় জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে।

শ্লোক ৩৪-৪২ – উপসংহার

📖 শ্লোক ৩৪ — (সঙ্গতি) উক্ত প্রকার আত্মজ্ঞান লাভের উপায় বলছেন –

গুরু ও শিষ্যের যোগ্যতা – সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে। তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

📖 শ্লোক ৩৫-৩৬ — (সঙ্গতি) জ্ঞানের ফল বলছেন –

সমস্ত জীবই আমার – হে পাণ্ডব! এভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমি আর মোহগ্রস্ত হবে না, কেন না এই জ্ঞানের দ্বারা তুমি দর্শন করবে যে, সমস্ত জীবই আমার বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ তারা সকলেই আমার এবং তারা আমাতে অবস্থিত।

জ্ঞানরূপ তরণী – তুমি যদি সমস্ত পাপীদের থেকেও পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাকে, তা হলেও এই জ্ঞানরূপ তরণীতে আরোহণ করে তুমি দুঃখ-সমুদ্র পার হতে পারবে।

📖 শ্লোক ৩৭ — (সঙ্গতি) পূর্বশ্লোকে যে বলা হয়েছে তত্ত্বজ্ঞানরূপ তরণীদ্বারা পাপসমুদ্র পার হওয়া যায়, তাতে পাপের নাশ হয় না—এরূপ ভ্রান্তির নিরসন করার জন্য এখন দৃষ্টান্তের সাহায্যে বলছেন –

প্রবলরূপে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, হে অর্জুন! তেমনই জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্মকে দগ্ধ করে ফেলে।

📖 শ্লোক ৩৮-৩৯ — (সঙ্গতি) "জ্ঞান কিভাবে কর্মকে দগ্ধ করে?" – এর উত্তরে শ্লোক ৩৮ এর প্রথম অর্ধেকে জ্ঞানের মাহাত্ম্য বলছেন।
"তাহলে সকলেই কেন এই আত্মজ্ঞানের অভ্যাস করে না?" – এর উত্তরে শ্লোক ৩৮ এর দ্বিতীয় অর্ধেক থেকে শুরু করে শ্লোক ৩৯ পর্যন্ত এই জ্ঞান লাভের পূর্বশর্ত বা যোগ্যতা বর্ণনা করছেন[4] –

জ্ঞানের মাহাত্ম্য – এই জগতে চিন্ময় জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছুই নেই। এই জ্ঞান সমস্ত যোগের পরিপক্ক ফল। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে যিনি সেই জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন, তিনি কালক্রমে আত্মায় পরা শান্তি লাভ করেন।

জ্ঞান লাভের পূর্বশর্ত – ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে যিনি সেই জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন, তিনি কালক্রমে আত্মায় পরা শান্তি লাভ করেন। সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হয়ে চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করেন। সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরা শান্তি প্রাপ্ত হন।

📖 শ্লোক ৪০ — (সঙ্গতি) জ্ঞানের অধিকারীর কথা বলে এখন তাদের বিপরীত, অর্থাৎ অনধিকারীর বিষয়ে বলছেন –

কে জ্ঞান লাভ করতে পারেনা? – অজ্ঞ ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না। সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুখভোগ করতে পারে না এবং পরলোকেও সুখভোগ করতে পারে না।

4 দীর্ঘকাল কর্মযোগদ্বারা সংসিদ্ধ–যোগ্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা অনায়াসে লাভ করেন।

📖 শ্লোক ৪১-৪২ — (সঙ্গতি) দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব ও পর ভুমিকাভেদে কর্ম ও জ্ঞানরূপ যে দ্বিবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, তা-ই দুটি শ্লোকদ্বারা উপসংহার করছেন –

সিদ্ধান্ত দ্বারা সংশয় নাশ – অতএব, হে ধনঞ্জয়! যিনি নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা কর্মত্যাগ করেন, জ্ঞানের দ্বারা সংশয় নাশ করেন এবং যিনি আত্মার চিন্ময় স্বরূপ অবগত হন, তাঁকে কোন কর্মই আবদ্ধ করতে পারে না।

জ্ঞানরূপ খড়্গ – অতএব, হে ভারত! তোমার হৃদয়ে যে অজ্ঞানপ্রসূত সংশয়ের উদয় হয়েছে, তা জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা ছিন্ন কর। যোগাশ্রয় করে যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও।

অধ্যায় উপসংহার

*** শ্রীল শ্রীধর স্বামী →

পুমবস্থাদিভেদেন কর্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা।
নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সংছিদম্ ॥

যিনি জীবের অধিকারাদিভেদে কর্ম ও জ্ঞানময়ী দ্বিবিধা নিষ্ঠার কথা বলেছেন, সংশয়ছেদনকারী সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।

*** শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর →

উক্তেষু মুক্ত্যুপায়েষু জ্ঞানমত্র প্রশস্যতে।
জ্ঞানোপায়স্তু কর্মৈবেত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ॥

মুক্তির কথিত উপায়সমূহের মধ্যে এখানে জ্ঞানের প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু কর্মই জ্ঞানের উপায়—অধ্যায়ের এই অর্থ নিরূপিত হয়েছে।

*** শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ →

দ্ব্যংশকং ধান্যবৎ কর্ম তুষাংশাদিব তণ্ডুলঃ।
শ্রেষ্ঠং দ্রব্যাংশতো জ্ঞানমিতি তুর্য্যস্য নির্ণয়ঃ ॥

কর্ম দুই অংশবিশিষ্ট ধানের মত, তার তুষের অংশ থেকে তণ্ডুল যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি সমস্ত দ্রব্য অংশ থেকে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, এটা চর্তুর্থ অধ্যায়ে নির্ণয় করা হয়েছে।

*** শ্রীল প্রভুপাদ →

এই অধ্যায়ে যে যোগমার্গের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাকে বলা হয় 'সনাতন–যোগ' অর্থাৎ জীবের উপযোগী শাশ্বত কার্যকলাপ। এই যোগে দুই রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান সাধিত হয়। তার একটি হচ্ছে দ্রব্যযজ্ঞ অর্থাৎ সবরকম জড় বিষয়কে উৎসর্গ করা এবং অন্যটি হচ্ছে আত্মজ্ঞান যজ্ঞ, যা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ পারমার্থিক কর্ম। দ্রব্যময়–যজ্ঞ যদি পারমার্থিক উদ্দেশ্যে সাধিত না হয়, তবে তা জড়-জাগতিক কর্মে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এই যজ্ঞ যদি পরমার্থ সাধন করবার জন্য, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে সাধিত হয়, তবে তা সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

পারমার্থিক কর্মও দুটি ভাগে বিভক্ত–নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করা। ভগবদ্গীতার যথার্থ জ্ঞান লাভ করলে এই দুটি তত্ত্বকেই অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। তখন অনায়াসে উপলব্ধি করা যায় যে, জীবাত্মা হচ্ছে ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই প্রকার উপলব্ধি পরম মঙ্গলময়, কারণ এই জ্ঞানের প্রভাবে ভগবানের দিব্য লীলা তত্ত্ব সহজেই বুঝতে পারা যায়। এই অধ্যায়ের প্রথমেই ভগবান নিজেই তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করেছেন।